উপন্যাস সমগ্র

কাজী নজরুল ইসলামের ব্যবহৃত ঝরনা কলম

উপন্যাস সমগ্র

নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম

KOBI PROKASHANI

সূ চি প ত্র

বাঁধনহারা	৯
মৃত্যুক্ষুধা	১১৭
কুহেলিকা	২১৩
নজরুল-গ্রন্থপঞ্জি	৩১৭
নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি	৩১০
গ্রন্থ-পরিচয়	৩০৬

উৎসর্গ

সুর-সুন্দর শ্রীনলিনীকান্ত সরকার
করকমলেষু

বন্ধু আমার! পরমাত্মীয়! দুঃখ-সুখের সাথী!
তোমার মাঝারে প্রভাত লভিল আমার তিমির রাতি।
চাওয়ার অধিক পেয়েছি—বন্ধু আত্মীয় প্রিয়জন,
বন্ধু পেয়েছি—পাইনি মানুষ, পাইনি দরাজ মন।
চারিদিক হতে বর্ষেছে শিরে অবিশ্বাসের গ্লানি,
হারায়েছি পথ—আঁধারে আসিয়া ধরিয়াছ তুমি পাণি।
চোখের জলের হয়েছ দোসর, নিয়েছ হাসির ভাগ,
আমার ধরায় রচেছে স্বর্গ তব রাঙা অনুরাগ।
হাসির গঙ্গা বয়েছে তোমার অশ্রু-তুষার গলি,
ফুলে ও ফসলে শ্যামল করেছ ব্যথার পাহাড়তলি!
আপনারে ছাড়া হাসায়েছ সবে হে কবি, হে সুন্দর;
হাসির ফেনায় শুনিয়াছি তব অশ্রুর মর্‌মর্‌!
তোমার হাসির কাশ-কুসুমের পার্শ্বে বহে যে ধারা,
সেই অশ্রুর অঞ্জলি দিনু, লহ এ 'বাঁধন-হারা'।

—নজরুল

কলিকাতা
২৪শে শ্রাবণ, ১৩৩৪

[ক]

করাচি সেনানিবাস
২০শে জানুয়ারি (সন্ধ্যা)

ভাই রবু!

আমি নাকি মনের কথা খুলে বলিনে বলে তুমি খুব অভিমান করেছ? আর তাই এতদিন চিঠিপত্তর লেখোনি? মনে থাকে যেন, আমি এই সুদূর সিন্ধুদেশে আরব-সিন্ধুর তীরে পড়ে থাকলেও আমার কোনো কথা জানতে বাকি থাকে না! সমঝে চলো, তারহীন বার্তাবহ আমার হাতে!

আমি মনে করেছিলাম—সংসারী লোক, কাজের ঠেলায় বেচারির চিঠি-পত্তর দেবার অবসর জোটেনি এবং কাজেই আর উচ্চবাচ্য করবার আবশ্যক মনে করিনি; কিন্তু এর মধ্যে তলে-তলে যে এই কাণ্ড বেধে বসে আছে, তা এ বান্দার ফেরেশ্‌তাকেও খবর ছিল না!—শ্রাদ্ধ এত দূর গড়াবে জানলে আমি যে উঠোন পর্যন্ত নিকিয়ে রাখতাম।

আমি পল্টনের 'গোঁয়ার গোবিন্দ' লোক কিনা, তাই অত-শত আর বুঝতে পারিনি; কিন্তু এখন দেখছি তুমিও ডুবে ডুবে জল খেতে আরম্ভ করেছ!

আমার আজ কেবলই গাইতে ইচ্ছে করছে সেই গানটা, যেটা তুমি কেবলই ভাবি সাহেবাকে (ওরফে ভবদীয় অর্ধাঙ্গিনীকে) শুনিয়ে শুনিয়ে গাইতে—

'মান করে থাকা আজকে কি সাজে?
মান-অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চল চল কুঞ্জ মাঝে।'

হাঁ—ভাবি সাহেবাও আমায় আজ এই পনেরো দিন ধরে একেবারেই চিঠি দেননি। স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী কিনা!

তোমার একখান ছোট্ট চিঠি সেই এক মাস পূর্বে—হাঁ, তা প্রায় একমাস হবে বই কি!—পেয়ে তার পরের দিনই 'প্যারেডে' যাওয়ার আগে এলোমেলো ভাবের কী কতকগুলো ছাইভস্ম যে লিখে পাঠিয়েছিলাম, তা আমার এখন মনে নেই। সেদিন মেজাজটা বড় খাট্টা ছিল, কারণ সবেমাত্র 'ডিউটি' হতে 'রিলিভ' হয়ে বা মুক্তি পেয়ে এসেছিলাম কিনা! তারপরেই আবার কয়েকজন পলাতক সৈনিককে ধরে আনতে 'ডেরাগাজি খাঁ' বলে একটা জায়গায় যেতে হয়েছিল। এসব হ-য-ব-র-ল'র মাঝে কি আর চিঠি লেখা হয় ভাই? তুমিই বা আর কীসে কম? এই একটা ছোট্ট ছুতো ধরে মৌনব্রত অবলম্বন করলে! এ মন্দ নয় দেখছি।

তুমি যে মনুকে লিখে জানিয়েছ যে, আমি 'মিলিটারি লাইনে' এসে গোরাদেরই মতো কাটখোট্টা হয়ে গেছি তাও আর আমার জানতে বাকি নেই। আগেই বলেছি, তারহীন বার্তাবহ হে, ওসব তারহীন বার্তাবহের সন্দেশ!

যখন আমায় কাটখোট্টা বলেই সাব্যস্ত করেছ, তখন আমার হৃদয় যে নিতান্তই সজনে কাঠের ঠ্যাঙার মতো শক্ত বা ভাঙা বাঁশের চোঙার মতো খনখনে নয়, তা রীতিমতোভাবে প্রমাণ করতে হবে। বিলক্ষণ দূর না হলে আমি অবিশ্যি এতক্ষণ 'যুদ্ধং দেহি' বলে আস্তিন গুটিয়ে দাঁড়াতাম; কিন্তু এত দূর থেকে তোমায় পাকড়াও করে একটা 'ধোবি আছাড়' দিবার যখন কোনোই সম্ভাবনা নেই, তখন মসিযুদ্ধই সমীচীন। অতএব আমি দশ হাত বুক ফুলিয়ে অসিমুক্ত মসিলিপ্ত হস্তে সদর্পে তোমায় যুদ্ধে আহ্বান করছি।—'যুদ্ধং দেহি!'

তোমার কথামতো আমি কাটখোট্টা হয়ে যেতে পারি; কিন্তু এটা তো জানো ভায়া যে, খোট্টাকাঠের ওপরও চোট পড়লে সেটা এমন আর্তনাদপূর্ণ খং শব্দ করে ওঠে, যেন ঠিক বুকের শুকনো হাড়ে কেউ একটা হাতুড়ির ঘা বসিয়ে দিল আর কি! তোমার মতো 'নবনীতকোমল মাংসপিণ্ডসমষ্টি'র পক্ষে সেটার অনুভব একেবারে অসম্ভব না হলেও অনেকটা অসম্ভব বই কি!

তা ছাড়া যেটা জানবার জন্য তোমার এত জেদ, এত অভিমান, তার তো অনেক কথাই জানো। তার ওপরেও আমার অন্তরের গভীরতর প্রদেশের অন্তরতম কথাটি জানতে চাও, পাকে-প্রকারে সেইটেই তুমি কেবলই জানাচ্ছ।—আচ্ছা ভাই রবু, আমি এখানে একটা কথা বলি, রেগো না যেন!

তোমার অভিমানের খাতিরে বেশি, না, আমার বুকের পাঁজর দিয়ে-ঘেরা হৃদয়ের গভীরতম তলে নিহিত এক পবিত্র স্মৃতিকণার বাহিরে প্রকাশ করে ফেলার অবমাননার ভয় বেশি, তা আমি এখনও ঠিক করে বুঝে উঠতে পারিনি। তুমিই আমায় জানিয়ে দাও ভাই, কী করা উচিত!

আচ্ছা ভাই, যে শুক্তি আর কিচ্ছু চায় না, কেবল ছোট্ট একটি মুক্তা হৃদয়ের গোপন কোণে লুকিয়ে থুয়ে অতল সমুদ্রের তলে নিজেকে তলিয়ে দিতে চায়, তাকে তুলে এনে তার বক্ষ চিরে সেই গোপন মুক্তাটা দেখবার এ কী মূঢ় অন্ধ আকাঙ্ক্ষা তোমাদের! এ কী নির্দয় কৌতূহল তোমাদের!

যাক শিগগির উত্তর দিয়ো। ভাবি সাহেবাকে চিঠি দিতে হুকুম করো নতুবা ভাবি সাহেবাকে লিখব তোমায় চিঠি দিতে হুকুম করবার জন্য।

খুকির কথা ফুটেছে কি? তাকে দেখবার বড় সাধ হয়।...সোফিয়ার বিয়ে সম্বন্ধে এখনও এমন উদাসীন থাকা কি উচিত? তুমি যেমন ভোলানাথ, মাও তথৈবচ! আমার এমন রাগ হয়!

আমার জন্য চিন্তা করো না। আমি দিব্যি কিষ্কিন্ধ্যার লবারের মতো আরামে আছি। আজকাল খুব বেশি প্যারেড করতে হচ্ছে। দুদিন পরেই আহুতি দিতে হবে কিনা! আমি পুনা থেকে বেয়নেট যুদ্ধ পাস করে এসেছি। এখন যদি তোমায় আমার এই শক্ত শক্ত মাংসপেশিগুলো দেখাতে পারতাম!

দেখেছ, সামরিক বিভাগের কী সুন্দর চটক কাজ? এখানে কথায় কথায় প্রত্যেক কাজে হাবিলদারজিরা হাঁক পাড়ছেন, 'বিজলি কা মাফিক চটক হও;—শাবাশ জোয়ান!'

এখন আসি। 'রোল-কলের' অর্থাৎ হাজিরা দেবার সময় হলো। হাজিরা দিয়ে এসে বেল্ট, ব্যান্ডোলিয়র বুট, পট্টি (এসব হচ্ছে আমাদের রণসাজের নাম) দস্তুরমতো সাফ-সুতরো করে রাখতে হবে। কাল প্রাতে দশ মাইল 'রুট মার্চ' বা পায়ে হন্টন।—ইতি

তোমার 'কাটখোট্টা লড়ুয়ে' দোস্ত
নূরুল হুদা

করাচি সেনাবিনাস
২১শে জানুয়ারি (প্রভাত)

মনু!

আজ করাচিটা এত সুন্দর বোধ হচ্ছে সে আর কী বলব! কী হয়েছে জানিস?

কাল সমস্ত রাত্তির ধরে ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে খুব একটা দাপাদাপির পর এখানকার উলঙ্গ প্রকৃতিটা অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দিব্যি শান্ত স্থির বেশে—যেন লক্ষ্মী মেয়েটির মতো ভিজে চুলগুলো পিঠের ওপর এলিয়ে দিয়ে রোদ্দুরের দিকে পিঠ করে বসে আছে! এই মেয়েই যে একটু আগে ভৈরবী মূর্তিতে সৃষ্টি ওলট-পালট করবার জোগাড় করেছিল, তা তার এখনকার এ সরল শান্ত মুখশ্রী দেখে কিছুতেই বোঝা যায় না। এখন সে দিব্যি তার আসমানি রঙের ঢলঢলে চোখ দুটি গোলাবি-নীল আকাশের পানে তুলে দিয়ে গম্ভীর উদাস চাউনিতে চেয়ে আছে। আর আর্দ্র ঋজু চুলগুলো বেয়ে এখনও দু-এক ফোঁটা করে জল ঝরে পড়ছে আর নবোদিত অরুণের রক্তরাগের ছোঁয়ায় সেগুলো সুন্দরীর গালে অশ্রুবিন্দুর মতো ঝিলমিল করে উঠছে! কিন্তু যতই সুন্দর দেখাক, তার এই গম্ভীর সারল্য আর নিশ্চেষ্ট ঔদাস্য আমার কাছে এতই খাপছাড়া খাপছাড়া ঠেকছে যে, আমি আর কিছুতেই হাসি চেপে রাখতে পারছিনে। বুঝতেই পারছ ব্যাপারটা;—মেঘে মেঘে জটলা, তার ওপর হাড়-ফাটানো কনকনে বাতাস; করাচি-বুড়ি সমস্ত রাত্তির এই সমুদ্দুরের ধারে গাছপালাশূন্য ফাঁকা প্রান্তরটায় দাঁড়িয়ে থুরুথুরু করে কেঁপেছে, আর এখানকার এই শান্তশিষ্ট মেয়েটিই তার মাথার ওপর বৃষ্টির পর বৃষ্টি ঢেলেছে। বজ্রের হুংকার তুলে বেচারিকে আরও শঙ্কিত করে তুলেছে; বিজুরির তড়িতালোকে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে আর সঙ্গিনী উন্মাদিনী ঝঞ্ঝার সঙ্গে হো-হো করে হেসেছে। তারপর সকালে উঠেই এই দিব্যি শান্তশিষ্ট মূর্তি, যেন কিচ্ছু জানেন না! আর কী, বলো তো ভাই এতে কার না হাসি পায়? আর এ একটা বেজায় বেখাপ্পা রকমের অসামঞ্জস্য কি না? আমার ঠিক এই প্রকৃতির দু-একটা মেয়ের কথা মনে পড়ে। খুব একটা 'জাঁদরেলি' গোছের দাপাদাপি দৌরাত্মির চোটে পাড়া মাথায় করে তুলেছেন; হঠাৎ তাঁর মনে

'দার্শনিকের অন্যমনস্কতা' চলে এলো আর অমনি এক লাফে তিনি তাঁর বয়সের আরও বিশ-পঁচিশটা বৎসর ডিঙিয়ে একজন প্রকাণ্ড প্রৌঢ়া গৃহিণীর মতো জলদগম্ভীর হয়ে বসলেন এবং কাজেই আমার মতো ঠোঁট কাটা ছ্যাবলার পক্ষে তা নিতান্তই সমালোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। সে রকম ধিঙ্গি মেয়েদের বিপক্ষে আমি আর অধিক বাক্যব্যয় করতে সাহস করিনে; কারণ—কারণ এই বুঝলে কিনা—এখনও আমার 'শুভদৃষ্টি' হয়নি। ভবিতব্য বলা যায় না ভাই! কবি গেয়েছেন—(মৎকর্তৃক সংস্কৃত)—

'প্রেমের পিঠ পাতা ভুবনে,
কখন কে চড়ে বসে কে জানে।'

অতএব এই স্থানেই আমার সুন্দরী-গুণ-কীর্তনে 'ফুলস্টপ'—পূর্ণচ্ছেদ!

আমার এই কাণ্ডজ্ঞানহীন গো-মুক্ষুর মতো যা-তা প্রলাপ শুনে তোর চক্ষু হয়তো এতক্ষণ চড়ক গাছ হয়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তও হচ্ছিস দস্তুরমতো। নয়?—হবারই কথা! আমার স্বভাবই এই। আমি এত বেশি আবোল-তাবোল বকি যে, লোকের তাতে শুধু বিরক্ত হওয়া কেন, কথঞ্চিৎ শিষ্ট প্রয়োগেরই কথা!

যাক এখন ওসব বাজে কথা। কী বলছিলাম? আজ প্রাতের আকাশটার শান্ত-সজল চাউনি আমায় বড্ড ব্যাকুল করে তুলেছে। তার ওপর আমাদের দয়ালু নকিব (বিউগ্লার) শ্রীমান গুপীচন্দর এইমাত্র 'নো প্যারেড' (আজ আর প্যারেড নেই) বাজিয়ে গেল। সুতরাং হঠাৎ-পাওয়া একটা আনন্দের আতিশয্যে সব ব্যাকুলতা ছাপিয়ে প্রাণটা আজকাল আকাশের মতো উদার হয়ে যাবার কথা! তাই গুপীকে আমরা প্রাণ খুলে আশীর্বাদ দিলাম সব, একেবারে চার হাত-পা তুলে। সে আশীর্বাদটা শুনবি? 'আশীর্বাদং শিরশ্ছেদং বংশনাশং অষ্টাঙ্গে ধবল কুষ্ঠং পুড়ে মরং।' এ উৎকট আশীর্বাদের জুলুমে বেচারা গুপী তার 'শিঙে' (বিউগল) ফেলে ভোঁ দৌড় দিয়েছে। বেড়ে আমোদে থাকা গেছে কিন্তু ভাই।

এমনি একটা আনন্দ পাওয়ার আনন্দ পাওয়া যেত, যখন বৃষ্টি হওয়ার জন্য হঠাৎ আমাদের স্কুল বন্ধ হয়ে যেত। স্কুল-প্রাঙ্গণে ছেলেদের উচ্চ হো-হো রোল, রাস্তায় জলের সঙ্গে মাতামাতি করতে করতে বোর্ডিংয়ের দিকে সাংঘাতিক রকমের দৌড়, সেখানে গিয়ে বোর্ডিং সুপারিন্টেন্ডেন্টের মুখের ওপর এমন 'বাদল দিনে' ভুনিখিচুড়ি ও কোর্মার সারবত্তা এবং উপকারিতা সম্বন্ধে কোমর বেঁধে অকাট্য যুক্তিতর্ক প্রদর্শন, অনর্থক অনাবিল অট্টহাসি—আহা, সে কী আনন্দের দিনই না চলে গেছে! জগতের কোনো কিছুরই বিনিময়ে আমাদের সে মধুর হারানো দিনগুলো আর ফিরে আসবে না। ছাত্রজীবনের মতো মধুর জীবন আর নেই এ কথাটা বিশেষ করে বোঝা যায় তখন, যখন ছাত্রজীবন অতীত হয়ে যায়, আর তার মধুর ব্যথাভরা স্মৃতিটা একদিন হঠাৎ অশান্ত জীবনযাপনের মাঝে ঝগ-ঝগ করে ওঠে।

আজ ভোর হতেই আমার পাশের ঘরে (কোয়ার্টারে) যেন গানের ফোয়ারা খুলে গেছে, মেঘমল্লার রাগিণীর যার যত গান জমা আছে 'স্টকে', কেউ আজ গাইতে

কসুর করছেন না। কেউ ওস্তাদি কায়দায় ধরছেন—'আজ বাদরি বরিখেরে ঝমঝম!' কেউ কালোয়াতি চালে গাচ্ছেন—'বঁধু এমন বাদরে তুমি কোথা!'—এই উল্টো দেশে মাঘ মাসে বর্ষা, আর এটা যে নিশ্চয়ই মাঘ মাস ভরা ভাদর নয়—তা জেনেও একজন আবার কবাটি খেলার 'চুঁ' ধরার সুরে গেয়ে যাচ্ছেন—'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।' সকলের শেষে গম্ভীর মধুরকণ্ঠ হাবিলদার পাণ্ডেমশাই গান ধরলেন—'হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে, সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।' গানটা সহসা আমার কোন সুপ্ত ঘায়ে যেন বেদনার মতো গিয়ে বাজল! হাবিলদার সাহেবের কোনো সজল-কাজল আঁখি প্রেয়সী আছে কি না, এবং আজকার এই 'শ্যামল ঘন নীল গগন' দেখেই তার সেইরূপ এক জোড়া আঁখি মনে পড়ে গেছে কি না, তা আমি ঠিক বলতে পারিনে, তবে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যেন আমারই হৃদয়ের লুকানো সুপ্ত কথাগুলো এই গানের ভাষা দিয়ে এই বাদল রাগিণীর সুরের বেদনায় গলে পড়ছিল। আমি অবাক হয়ে শুনতে লাগলাম—

'হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে ॥
অধর করুণা-মাখা,
মিনতি বেদনা-আঁকা
নীরবে চাহিয়া-থাকা
বিদায় ক্ষণে,
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে ॥
ঝরঝর ঝরে জল বিজুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।
আমার পরানপুটে
কোনখানে ব্যথা ফুটে,
কার কথা বেজে উঠে
হৃদয় কোণে,
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে ॥'

গান হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে দু-চারজন সমঝদার টেবিল, বই, খাটিয়া যে যা পেয়েছে সামনে, তাই তালে-বেতালে অবিশ্রান্ত পিটিয়ে চলেছে। এক একজন যেন মূর্তিমান 'বেতাল পঞ্চবিংশতি।' আবার দু-একজন বেশি রকমের রসজ্ঞ ভাবে বিভোর হয়ে গোপাল রায়ের অনুকরণে—'দাদা গাই দেখসে, গরু তার কী দেখব; দ্যাখ্ ঠাকুরদ্দার বিয়ে, ধুচনি মাথায় দিয়ে;—বাবারে, প্যাট গ্যালরে, শা...তোর কি হোলোরে' ইত্যাদি সুমধুর বুলি অবিরাম আওড়িয়ে চলেছেন। যত না বুলি চলেছে, মাথা-হাত-পা-মুখ নড়ছে তার চেয়ে অস্বাভাবিক রকমের বেশি! গানটা ক্রমে 'আঙ্কোর প্লিজ'—'ফিন জুড়ো' প্রভৃতির খাতিরে দু-তিনবার গীত হলো। তারপর যেই এসে সমরে মাথায় ঘা পড়েছে, এমনি চিত্র-বিচিত্র কণ্ঠে সীমা ছাড়িয়ে একটা

বিকট ধ্বনি উঠল, 'দে গরুর গা ধুইয়ে!—তোমার ছেলের বাপ মরে যাক ভাই! তুই মরলে আর বাঁচবিনে বাবা!' সঙ্গে সঙ্গে বুটপট্টি পরা পায়ে বীভৎস তাণ্ডবনৃত্য!—এদের এ উৎকট সমঝ-বুদ্ধিতে গানটার অনেক মাধুর্য নষ্ট হয়ে গেলেও মনে হচ্ছে এও যেন আমাদের আর একটা ছাত্রজীবন। একটা অখণ্ড বিরাট আমোদ এখানে সর্বদাই নেচে বেড়াচ্ছে। যারা কাল মরবে তাদের মুখে এত প্রাণ-ভরা হাসি বড্ড অকরুণ!

আমার কানে এখনও বাজছে—

'—পড়িল মনে
অধর করুণা-মাখা,
মিনতি-বেদনা-আঁকা,
নীরবে চাহিয়া-থাকা
বিদায় ক্ষণে।'

আর তাই আমার এ পরানপুটে কোনখানে ব্যথা ফুটছে, আর হৃদয়কোণে কার কথা বেজে বেজে উঠছে।

আমি আমার নির্জন কক্ষটিতে বসে কেবলই ভাবছি যে, কার এ 'বিপুল বাণী এমন ব্যাকুল সুরে' বাজছে, যাতে আমার মতো শত শত হতভাগার প্রাণের কথা, হৃদয়ের ব্যথা এমন মর্মন্তুদ হয়ে চোখের সামনে মূর্তি ধরে ভেসে ওঠে? ওগো, কে সে কবিশ্রেষ্ঠ, যাঁর দুটি কালির আঁচড়ে এমন করে বিশ্বের বুকের সুষুপ্ত ব্যথা চেতনা পেয়ে ওঠে? বিস্মৃতির অন্ধকার হতে টেনে এনে প্রাণ-প্রিয়তমের নিদারুণ করুণ স্মৃতিটি হৃদয়ের পরতে-পরতে আগুনের আখরে লিখে থুয়ে যায়? আধ-ভোলা আধ-মনে-রাখা সেই পুরানো অনুরাগের শরমজড়িত রক্তরাগটুকু চির-নবীন করে দিয়ে যায়। কে গো সে কে?—তাঁর এ বিপুল বাণী বিশ্ব ছাপিয়ে যাক, সুরের সুরধুনী তাঁর জগৎময় বয়ে যাক! তাঁর চরণারবিন্দে কোটি কোটি নমস্কার!

'বিদায় ক্ষণের' নীরবে চেয়ে থাকার স্মৃতিটা আমার সারা হৃৎপিণ্ডটায় এমন একটা নাড়া দিল যে, বত্রিশ নাড়ি পাক দিয়ে আমারও আঁখি সজল হয়ে উঠেছে। ভাই মনু, আমায় আজ পুরানো দিনের সেই নিষ্ঠুর স্মৃতি বড্ড ব্যথিয়ে তুলেছে! বোধহয় আবার ঝরঝর করেই জল ঝরবে। এ আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা ধরবার কোথাও ঠাঁই নেই।

খুব ঘোর করে পাহাড়ের আড়াল থেকে এক দল কালো মেঘ আবার আকাশ ছেয়ে ফেলল! আর কাগজটা দেখতে পাচ্ছিনে, সব যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

* * *

(বিকেল বেলা)

হাঁ, এইবার চিঠিটা শেষ করে ফেলি। সকালে খানিকক্ষণ গান করে বিকেল বেলা এখন মনটা বেশ হালকামতো লাগছে।

চিঠিটা একটু লম্বা চওড়া হয়ে গেল। কী করি, আমার লিখতে বসলে কেবলই ইচ্ছা হয় যে, হৃদয়ের সমস্ত কথা, যা হয়তো বলতে সংকোচ আসবে, অকপটে লিখে যাই। কিন্তু সবটা পারি কই? আমার সবই আবছায়ার মতো। জীবনটাই আমার অস্পষ্টতায় ঘেরা।

রবিয়লকে চিঠি লিখেছি কাল সন্ধ্যায়। বেশ দু-একটা খোঁচা দিয়েছি! রবিয়ল অসংকোচে আমার ওপর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের যে রকম দাবি করে, আমি কিছুতেই তেমনটি পারি না। কী জানি কেন, তার ওপর স্বতঃই ভক্তিমিশ্রিত কেমন একটা সংকোচের ভাব আসে। তবুও সে ব্যথা পাবে বলে আমি নিতান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতোই তার সঙ্গে চিঠিপত্তর ব্যবহার করি। কথাটা কি জানো? সে একটু যেন মুরুব্বি ধরনের, কেমন রাশভারী লোক, তাতে পুরোদস্তুর সংসারী হয়ে পড়ছে। এরূপ লোকের সঙ্গে আমাদের মতো ছাল-পাতলা লোকের মোটেই মিশ খায় না। কিন্তু ও আর আমি যখন বাঁকুড়া কলেজিয়েট স্কুলে পড়তাম, তখন তো এমন ছিল না।

লোকটার কিন্তু একটা গুণ, লোকটা বেজায় সোজা! এই রবিয়ল না থাকলে বোধহয় আমার জীবন-স্রোত কোন অচেনা অন্য দিকে প্রবাহিত হতো। রবু আমায় একাধারে প্রাণপ্রিয়তম বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ ভ্রাতার মতোই দেখে। রবিয়লের—রবিয়লের চেয়েও সুন্দর স্নেহ আমি কখনো ভুলব না।

সংসারে আমার কেউ না থাকলেও রবিয়লদের বাড়ির কথা মনে হলে মনে হয় যেন আমার ভাই-বোন-মা সব আছে!

রবিয়লের স্নেহময়ী জ্যোতির্ময়ী জননীর কথা মনে হলে আমার মাতৃবিচ্ছেদ-ক্ষতটা নতুন করে জেগে ওঠে।—আমি কিন্তু বড্ড অকৃতজ্ঞ! না? বড্ড অকৃতজ্ঞ! না?

এখন আসি ভাই—বড্ড মন খারাপ কচ্ছে। ইতি—

হতভাগা—
নূরুল হুদা

[খ]

সালার
২৯শে জানুয়ারি
(প্রভাত—চায়ের টেবিল সম্মুখে)

নূরু!
তোর চিঠিটা আমার ভোজপুরি দারোয়ান মশায়ের 'থ্রু' দিয়ে কাল সান্ধ্য-চায়ের টেবিলে ক্লান্ত করুণ বেশে এসে হাজির। দেখি, রিডাইরেকটের ধস্তাধস্তিতে বেচারার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। আমি ক্ষিপ্রহস্তে সেই চক্রলাঞ্ছিত, ওষ্ঠাগতপ্রাণ,

প্রভুভক্ত লিপিবরের বক্ষ চিরে তার লিপিলীলার অবসান করে দিলাম।—বেজায় উষ্ণ-মস্তিষ্ক চায়ের কাপ তখন আমার পানে রোষকষায়িত লোচনে চেয়ে চেয়ে ধূম্র উদ্‌গিরণ করতে লাগল। খুব ধৈর্যের সঙ্গে তার লিপিচাতুর্য—যাকে আমরা মোটা কথায় বাগাড়ম্বর বলি—দেখে খানিকটা ঠাণ্ডা দুধ ঢেলে আগে চায়ের ক্রোধ নিবারণ করলাম। তারপর দুচামচ চিনির আমেজ দিতেই এমন বদরাগী চায়ের কাপটি দিব্যি দুধে-আলতায় রঙিন হয়ে শান্ত-মধুর রূপে আমার চুম্বনপ্রয়াসী হয়ে উঠল। তুই শুনে ভয়ানক আশ্চর্য হবি যে, তোর 'কোঁদলে' 'চামুণ্ডা' 'রণরঙ্গিণী' ভাবি সাহেবা 'তত্রস্থানে' সশরীরে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও (অবশ্যি, তখন গুম্ফশ্মশ্রুবহুল বিশাল লাঠিস্কন্ধে ভোজপুরি মশাই ছিলেন না সেখানে) এবং তাঁর মৌরসিস্বত্ব বেমালুম বেদখল হচ্ছে দেখেও তিনি কোনো আপিল পেশ করেননি।

আহা হা! তাঁর মতো স্বামীসুখাভিলাষিণী, 'উদ্ভট ত্যাগিনী' এ ঘোর কলিকালের মরজগতে নিতান্তই দুর্লভ রে, নিতান্তই দুর্লভ। আশা করি মৎকর্তৃক তোর শ্রদ্ধেয়া ভাবি সাহেবার এই গুণকীর্তন (কোঁদলে রণরঙ্গিণী আর চামুণ্ডা এই কথা কটি বাদ দিয়ে কিন্তু!) তোর পত্র মারফতে তাঁর গোচরীভূত হতে বাকি থাকবে না।

আমাদের খুকির বেশ দু-একটি করে কথা ফুটছে।—এই দেখ, সে এসে তোর চিঠিটার হাঁ-করে থাকা ক্লান্ত খামের মুখে চামচা চামচা চা ঢেলে তার তৃষ্ণা নিবারণ করছে, আর বলছে 'চা-পিয়াচ!'—সে তোর ঐ রণসাজ পরা খেজুর গাছের মতো ফটোটা দেখে চা—চা করে ছুটে যায়, আবার দু-এক সময় ভয়ে পিছিয়ে আসে। এই খুদে মেয়েটা সংসারের সঙ্গে আমায় পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলেছে। শুধু কি তাই? এ 'আফলাতুন' মেয়ের জুলুমে মায়েরও পরমার্থ-চিন্তা অনেক কমাতে হয়েছে। আর সোফিয়ার তো সে জান! মাকে সেদিন এই নিয়ে ঠাট্টা করাতে, মা বললেন, 'বাবা, মূলের চেয়ে সুদ পিয়ারা! এখন ঠাট্টা করছিস, পরে বুঝবি, যখন তোর নাতি-পুতি হবে।'—মার নামাজ পড়ার তো সে ঘোর বিরোধী। মা যখন নামাজ পড়বার সময় সেজদা যান, সে তখন হয় মায়ের ঘাড়ে চড়ে বসে থাকে, নতুবা তাঁর সেজদার জায়গায় বসে 'দা-দা' করে এমন করুণভাবে কাঁদতে থাকে যে, মায়ের আর তখনকার মতো নামাজই হয় না! আবার দেখাদেখি সেও খুব গম্ভীরভাবে নামাজ পড়ার মতো মায়ের সঙ্গে ওঠে আর বসে! তা দেখে আমার তো আর হাসি থামে না! এই এক রত্তি মেয়েটা যেন একটা পাকা মুরুব্বি! ঝিদের অনুকরণে সে আবার মায়ের হাত-মুখ খিঁচিয়ে মায়ের সাথে 'কেজিয়া' করতে শিখেছে। দুষ্টু ঝিগুলোই বোধহয় শিখিয়ে দিয়েছে—খুকি কেজিয়ার সময় মাকে হাত নেড়ে নেড়ে বলে, 'দুঃ! ছতিন।—ছালা—ছতিন!'

তোকে অনেক কথাই জানাতে হবে। কাজেই চিঠিটা হয়তো তোরই মতো 'বক্তিমে'য় ভরা বলে বোধ হবে। অতএব একটু মাথা ঠাণ্ডা করে পড়িস। আমরা হচ্ছি সংসারী লোক, সবসময় সময় পাই না। আবার সময় পেলেও চিঠি লেখার মতো একটা শক্ত কাজে হাত দিতে ইচ্ছে হয় না। তাতে আমার ধাত তো তোর

জানা আছে—যখন লিখি তখন খুবই লিখি, আবার যখন লিখিনে তখন একেবারে গুম। তুই আমার অভিমানের কথা লিখেছিস; কিন্তু ঐ মেয়েলি জিনিসটার সঙ্গে আমার বিলকুল পরিচয় নেই। আর তারহীন বার্তাবহের সন্দেশ বলে বেশি লাফালাফি করতে হবে না তোকে, ও সন্দেশওয়ালার নাম আমি চোখ বুজেই বলে দিতে পারি। তিনি হচ্ছেন, আমার সহধর্মিণী-সহোদর শ্রীমান মনুয়র! দেখেছিস আমার দরবেশি কেরামতি। তুই হচ্ছিস একটি নিরেট আহাম্মক, তা না হলে ওর কথায় বিশ্বাস করিস? হাঁ, তবে একদিন কথায় কথায় তোকে কাটখোট্টা বলে ফেলেছিলুম বটে! কিন্তু তোর এখনকার লেখার তোড় দেখে আমার বাস্তবিকই অনুশোচনা হচ্ছে যে, তোকে ওরকম বলা ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে! এখন আমার ইচ্ছে হচ্ছে, তোর ঘাড়ে কিছু ভয়ানক রকমের উপাধিব্যাধি চড়িয়ে দিই; কিন্তু নানান ঝঞ্ঝাটে আমার বুদ্ধিটা আজ মগজে এমন সাংঘাতিক রকমে দৌড়ে বেড়াচ্ছে যে, তার লাগামটি কষে ধরবারও জো'টি নেই!...

এই হয়েছে রে—হ—য়ে—ছে! ইতিমধ্যে পাশের ঘরে মুড়ো ঝাটাহস্তে দুটো ঝিয়ের মধ্যে একটা কোঁদল 'ফুল ফোর্সে' আরম্ভ হয়ে গেছে।—বুঝেছিস এই মেয়েদের মতো খারাপ জানোয়ার আর দুনিয়ায় নেই। এরা হচ্ছে পাতিহাঁসের জাত। যেখানে দু-চারটে জুটবে, সেখানেই 'কচর কচর বকর বকর' লাগিয়ে দেবে। এদের জ্বালায় ভাবুকের ভাবুকতা, কবির কল্পনা এমন করুণভাবে কর্পূরের মতো উবে যায় যে, বেচারিকে বাধ্য হয়ে তখন শান্তশিষ্ট ল্যাজবিশিষ্ট একটি বিশেষ লম্বকর্ণ ভারবাহীর মতোই নিশ্চেষ্ট ভ্যাবাকান্ত হয়ে পড়তে হয়। গেরো—গেরো! দুত্তোর মেয়ে-মানুষের কপালে আগুন! এরা এ ঘর হতে আমায় উঠাবে তবে ছাড়বে দেখছি। অতএব আপাতত চিঠি লেখা মুলতবি রাখতে হলো ভাই। আমার ইচ্ছে হয়, এই মেয়েগুলোকে গরু-খেদা করে খেদিয়ে তেপান্তরের মাঠে ঠেলে উঠাই গিয়ে। ওঃ, সব গুলিয়ে দিল আমার!

*　　*　　*

(দুপুর বেলা)

বাপরে বাপ! বাঁচা গেছে!—ঝি দুটোর মুখে ফেনা উঠে এইমাত্র তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। অতএব কিছুক্ষণের জন্য মাত্র সে ঝগড়াটা ধামাচাপা আছে। এই অবসরে আমিও চিঠিটা শেষ করে ফেলি। নইলে, ফের জেগে উঠে ওরা যদি ঝগড়াটার জের চালায় তা হলেই গেছি আর কি!

অনেক সময় হয়তো আমার কাজে কথায় একটু মুরুব্বি ধরনের চাল অলক্ষিতেই এসে পড়ে। আর তোর মতো চিরশিশু মনের তাতেই ঠেকে হোঁচট খেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা লেগে যায়, নয়? কিন্তু আমার এদিন ছিল না, আমার মনে তোরই মতো একটি চিরশিশু জাগ্রত ছিল রে, সে আজ বাঁধা পড়ে তার সে সরল চঞ্চলতা আর আকুলতা ভুলে গিয়েছে। তাই বড় দুঃখে আমার সেই মনের বনের হরিণশিশু